তওহীদভিত্তিক আধুনিক সমাজে সংস্কৃতিচর্চার দিগন্ত

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

পিঠা মেলা

হা-ডু-ডু খেলা

দলীয় সঙ্গীত

সঙ্গীতানুষ্ঠান

মঞ্চ নাটক

গ্রামীণ ঐতিহ্য প্রদর্শনী

শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। আল্লাহর দীন ইসলাম কখনোই এই প্রবণতাকে অস্বীকার করেনি কিংবা নিষিদ্ধও করেনি। ইসলামপূর্ব আরবে কবিতা ও গানের মধ্যে অশ্লীলতার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু রাসুল (সা.) এসবের চর্চাকে নিষিদ্ধ করেননি; কেবল অশ্লীলতা পরিহার করতে বলেছেন।

আল্লাহ কোরআনে হারাম বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং হালাল-হারামের নীতিমালাও ঘোষণা করেছেন। তিনি হারাম করেছেন তিনটি বিষয়। প্রথমত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতা। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর অবাধ্যতা ও অন্যায়-অত্যাচার। তৃতীয়ত, আল্লাহর সঙ্গে শিরক এবং তাঁর নামে মনগড়া কথা আরোপ করা (সুরা আরাফ ৭:৩৩)।

এই নীতির আলোকে শিল্প-সংস্কৃতিও হারাম নয়, তবে এর চর্চা হতে হবে অশ্লীলতা, মিথ্যা, প্রতারণা ও আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে মুক্ত। রাসুলের (সা.) যুগে সাহাবাদের বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে গান গাওয়া ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো। রাসুল (সা.) ছিলেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত পুরুষ ও মহান বিপ্লবী, যিনি মাত্র নয় বছরে শতাধিক যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছেন এবং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর জীবনে গান-বাজনায় মগ্ন হওয়ার অবসর ছিল না। তবুও দেখা যায়, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর কিংবা অবসরে গৃহে তাঁর সামনে গান পরিবেশন করা হয়েছে, এবং তিনি তা শুনেছেন, নিষেধ করেননি।

অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির প্রতিটি দ্বার উন্মুক্ত। কবিতা, গান, নাটক, অভিনয়, নৃত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য রচনা, কারুশিল্প, ফটোগ্রাফি এবং চলচ্চিত্র সবগুলোই শিল্প-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যদি এগুলো অশ্লীলতা ও আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন থেকে মুক্ত থাকে, তবে সেগুলো বৈধ ও কল্যাণকর। ইসলাম এর চর্চাকে উৎসাহিত করে। তবে মনে রাখতে হবে, বিনোদন জীবনের একটি অংশ হলেও এটি মানুষের প্রধান কাজ নয়। মানুষের মুখ্য দায়িত্ব হলো আল্লাহর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব করা, আর সংস্কৃতি চর্চা হবে মানুষের সুস্থ বিনোদন ও মানবতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

যোগাযোগ: 01711005025, 01783598222, 01768285624 (হোয়াটসঅ্যাপ)

www.hezbuttawheed.org
www.youtube.com/@hezbuttawheed
www.facebook.com/emamht

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তওহীদভিত্তিক আধুনিক সমাজে সংস্কৃতিচর্চার দিগন্ত

সংস্কৃতি যে কোনো সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব ইতিহাসে কখনও এমন কোনো সভ্যতার বিকাশ হয়নি যেখানে শিল্পচর্চা ছিল না। কারণ এগুলো মানুষের প্রাকৃতিক প্রবণতা বা চাহিদা। তাই আল্লাহর দীনও এগুলোকে পরিহার করতে বলে না, বরং একে তার প্রাপ্য স্থানটি প্রদান করে। সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, **সংস্কৃতি বলতে সেই সকল পন্থাকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে মানব জাতি তাদের প্রকৃতিগত বর্বরতাকে কাটিয়ে উঠে মানবিকতার বিকাশ ঘটিয়ে পূর্ণরূপে মানুষে পরিণত হয়।** কোনো এলাকার মানুষের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যকলা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। গান, নাটক, সিনেমা, অভিনয়, চিত্রকলা, সাহিত্য - এগুলো হলো সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটি মাধ্যম।

আজ সমগ্র বিশ্বে চলছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে দখল করে নিচ্ছে, সীমান্তে সীমান্তে চলছে সংঘাত। কিছুতেই এ অন্যায়-অশান্তি ও রক্তপাত বন্ধ করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছে তার কোনো প্রতিকার নেই। ফিলিস্তিনে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেখানকার মানুষকে পরিকল্পিতভাবে দুর্ভিক্ষে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক হলো- ত্রাণ ও চিকিৎসা নিতে যাওয়া সাধারণ নারী-শিশুদের ওপর বোমা বর্ষণ করে তাদের পাখির মতো হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু সারা পৃথিবী এ বিষয়ে নিশ্চুপ। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারেও রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর চলছে ভয়াবহ নির্যাতন। ২২ লক্ষ মুসলিমকে তাদের জন্মভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা আজ উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে এবং মানবেতর জীবনযাপন করছে।

অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। আওয়ামী সরকারের পতনের এক বছর অতিক্রান্ত হলেও রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। সেই আন্দোলনে মানুষ রক্ত দিয়েছে, জীবন উৎসর্গ করেছে, কেউ কেউ আজীবনের জন্য বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু এত ত্যাগের পরও বৈষম্য, জুলুম, মব-সহিংসতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির অবসান ঘটেনি। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও সংঘাত ও রক্তপাত হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এমন বাস্তবতায় সরকার বিদ্যমান ব্যবস্থায় কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে। তাদের বিশ্বাস, এসব সংস্কারের

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তওহীদভিত্তিক আধুনিক সমাজে সংস্কৃতিচর্চার দিগন্ত

সংস্কৃতি যে কোনো সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব ইতিহাসে কখনও এমন কোনো সভ্যতার বিকাশ হয়নি যেখানে শিল্পচর্চা ছিল না। কারণ এগুলো মানুষের প্রাকৃতিক প্রবণতা বা চাহিদা। তাই আল্লাহর দীনও এগুলোকে পরিহার করতে বলে না, বরং একে তার প্রাপ্য স্থানটি প্রদান করে। সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, **সংস্কৃতি বলতে সেই সকল পন্থাকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে মানব জাতি তাদের প্রকৃতিগত বর্বরতাকে কাটিয়ে উঠে মানবিকতার বিকাশ ঘটিয়ে পূর্ণরূপে মানুষে পরিণত হয়।** কোনো এলাকার মানুষের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যকলা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। গান, নাটক, সিনেমা, অভিনয়, চিত্রকলা, সাহিত্য - এগুলো হলো সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটি মাধ্যম।

আজ সমগ্র বিশ্বে চলছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে দখল করে নিচ্ছে, সীমান্তে সীমান্তে চলছে সংঘাত। কিছুতেই এ অন্যায়-অশান্তি ও রক্তপাত বন্ধ করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছে তার কোনো প্রতিকার নেই। ফিলিস্তিনে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেখানকার মানুষকে পরিকল্পিতভাবে দুর্ভিক্ষে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক হলো-ত্রাণ ও চিকিৎসা নিতে যাওয়া সাধারণ নারী-শিশুদের ওপর বোমা বর্ষণ করে তাদের পাখির মতো হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু সারা পৃথিবী এ বিষয়ে নিশ্চুপ। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারেও রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর চলছে ভয়াবহ নির্যাতন। ২২ লক্ষ মুসলিমকে তাদের জন্মভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা আজ উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে এবং মানবেতর জীবনযাপন করছে।

অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। আওয়ামী সরকারের পতনের এক বছর অতিক্রান্ত হলেও রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। সেই আন্দোলনে মানুষ রক্ত দিয়েছে, জীবন উৎসর্গ করেছে, কেউ কেউ আজীবনের জন্য বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু এত ত্যাগের পরও বৈষম্য, জুলুম, মব-সহিংসতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির অবসান ঘটেনি। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও সংঘাত ও রক্তপাত হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এমন বাস্তবতায় সরকার বিদ্যমান ব্যবস্থায় কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে। তাদের বিশ্বাস, এসব সংস্কারের

মাধ্যমে পরিবর্তন আসবে এবং চলমান সংকট নিরসন সম্ভব হবে। কিন্তু অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো দ্রুত নির্বাচনের দাবি তুলছে। তাদের বক্তব্য, কেবল জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারই এই অচলাবস্থা কাটিয়ে দেশের জন্য একটি স্থায়ী সমাধান দিতে সক্ষম হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট, বিদ্যমান মানবরচিত ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে কেবল কিছু কাটছাঁট বা সংস্কার করে কিংবা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে সমাজে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ, অতীতে বহুবার নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। সংবিধানও সংস্কার করা হয়েছে সতেরো বার। কিন্তু দুর্নীতি, মিথ্যা মামলা, জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, নারী নির্যাতন, সুদ-ঘুষ, খুন-ধর্ষণ, এসব অনিয়ম-অপরাধ একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, মানুষের তৈরি ব্যবস্থা মানুষকে অশান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। এখন প্রয়োজন আল্লাহর প্রেরিত জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সেটি প্রতিষ্ঠিত করা।

কিন্তু এই আধুনিক যুগে এসে আমরা যখন আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলি, তখন স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরনের প্রশ্ন সামনে আসে। কেউ প্রশ্ন করে- 'ইসলাম তো সুদকে হারাম করেছে, অথচ পুরো বিশ্ব অর্থনীতি সুদের ভিত্তিতে চলে। আধুনিক এই জটিল অর্থনীতির যুগে সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে আপনারা কী ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রস্তাব করছেন?' কেউ প্রশ্ন করে, **'আমাদের সমাজে শুধুমাত্র মুসলিম নয়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষও বাস করছে। তারা কেন ইসলামি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?' কেউ আবার প্রশ্ন করে, 'হাত কেটে দেওয়া, পাথর ছুঁড়ে হত্যার মতো আইন আধুনিক যুগের মানুষ কীভাবে মেনে নেবে?'** শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও অনেকের মধ্যে সংশয় রয়েছে।

এই প্রশ্নগুলো সাধারণত শিক্ষিত, সচেতন, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্য থেকে আসে। এসব প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিয়েছেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম তাঁর গ্রন্থ 'তওহীদ ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা' এ। বইটি পড়লেই আশা করা যায় সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে। তবে এখানে আমরা বিশেষভাবে আলোকপাত করব- তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র কেমন হবে, সে বিষয়ে।

যারা শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম যেমন নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্যের চর্চা করে থাকেন তারা তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা শুনলেই গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকেন। তারা ভাবেন, তওহীদ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে হালাল হারামের ফতোয়া দিয়ে সুকুমারবৃত্তির চর্চা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যেমনটা করেছে তালেবান, আই.এস। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর আলেম সমাজও ওয়াজ-মাহফিলে বিভিন্ন শিল্পচর্চাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়ে থাকে। সেই ফতোয়াগুলোর বাস্তবায়নের জন্য তাদের অন্ধ অনুসারীরা বিভিন্ন সঙ্গীত চর্চা কেন্দ্র, মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়ে থাকে। কখনও কখনও সিনেমা হলে বোমা

হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এই হামলাগুলোতে তওহীদী জনতা বা কোনো ধর্মীয় সংগঠনের ব্যানার ব্যবহার করা হয়েছে।

মানুষ বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিভিন্ন রূপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে সৌদি আরব, ইরান ও তালেবানদের শিল্প-সংস্কৃতি সংক্রান্ত অতি-রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে ইসলামের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে বিদ্বেষপরায়ণ করে তুলেছে। বর্তমানে ইসলামের নামে যে অন্ধ গোড়ামির কট্টরপন্থী চর্চা দেখা যাচ্ছে, তাতে কর এমন ইসলামোফোবিয়া সৃষ্টি হওয়া মোটেই অমূলক নয়।

শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং শিক্ষিত, চিন্তাশীল সমাজ লক্ষ্য করেন, রেনেসাঁর পর ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের ফলে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। উদারনৈতিকতা ও গণতন্ত্রের কারণে ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংস্কৃতি চর্চার দ্বার সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয়েছে। সেখানে কোনো অযাচিত বিধি-নিষেধ নেই, ধর্মের নামে জবরদস্তি নেই। ফলে একজন বিজ্ঞানী স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে পারেন, একজন শিল্পী তার সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ করতে পারেন, একজন সাহিত্যিক বা জ্ঞানী ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন। ইউরোপের এই ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও উদারতার প্রদর্শনী দেখে অনেকেই পশ্চিমা সমাজের প্রতি অন্ধভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছেন।

পক্ষান্তরে, মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি ভিন্ন। আমাদের শিক্ষিত সমাজ যখন ইউরোপের উদার সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তারা লক্ষ্য করেন, ইসলামের নামে শিল্প-সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতা প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেকের মনে ধারণা জন্মায় যে ইসলাম বা কোর'আনই এই সীমাবদ্ধতার কারণ, যদিও এ ধারণা অমূলক। আরও উদ্বেগজনক হলো, মাদ্রাসা শিক্ষিত এবং কথিত আলেম সমাজ কোর'আনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা তুলে ধরে এক ধরনের বয়ান বা ন্যারেটিভ তৈরি করছে, যা শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিমনা মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করছে। তারা ধারণা করে, যদি ইসলাম রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে, তাহলে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাধীন চর্চা সম্ভব হবে না। দেশে উগ্রবাদের উত্থানের আশঙ্কা, শিল্পচর্চায় বাধা, কাজের সুযোগ কমে যাওয়া ও অনিরাপদ পরিবেশের কারণে বিগত এক বছরে অনেক শিল্পী দেশ ছেড়ে বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন (২ অক্টোবর ২০২৫- কালেরকণ্ঠ)। এই প্রাসঙ্গিকতা মাথায় রেখেই এই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে, যাতে স্পষ্টভাবে বোঝানো যায় যে সমস্যা ইসলাম নয়, বরং ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা ও প্রথাগত জবরদস্তিই মূল বাধা।

এখানে আমরা তুলে ধরব- ইসলাম কী এবং সংস্কৃতি কী; ইসলামের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কোথায়; এবং আদৌ এদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব আছে কি না। আমরা দেখাবো- ইসলাম কি সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করছে, নাকি উৎসাহিত করছে, নাকি আসলে সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার পথকে রুদ্ধ করতে চায়। এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত উপস্থাপন করছি। বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা বই আকারে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা জমা দিয়েছি এবং সভা-সেমিনার করে সমাজের জ্ঞানী-গুণী ও সুধীজনদের কাছেও এই বক্তব্য পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা আশা করি, তারা এ

বিষয়ে মতামত জানাবেন, আর সকলের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই।

সংস্কৃতি কাকে বলে?

ইংরেজি 'Culture'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম এই শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম একজন গবেষক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় 'Culture' অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটা প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ এর অনুমোদন দেন। এর আগে বাংলায় 'কৃষ্টি' শব্দটি চালু ছিল 'Culture' অর্থে। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দটা মনে করতেন, কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত, সুতরাং 'Culture' অর্থে 'সংস্কৃতি'ই উপযুক্ত। সংস্কৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'পরিশোধন' বা 'উন্নতকরণ'। অর্থাৎ, সংস্কৃতি বলতে মানুষের এমন সব অনুশীলনকে বোঝানো হয় যা জীবনকে উন্নত ও পরিশীলিত করে।

পারিভাষিক অর্থে সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবন ধারা, জীবন শৈলী তথা জীবনযাত্রার একটি সামগ্রিক রূপ। আমাদের চাল-চলন বা সামাজিক আচরণ, প্রথা, অনুষ্ঠান, ভাষা-সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্য, ধর্ম, বিশ্বাস, নৈতিকতা, সম্পর্ক, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবনের উদ্দেশ্য এই সবকিছু মিলিয়েই কিন্তু আমাদের জীবনধারা, এগুলি নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি জীবনযাত্রার এমন বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠীকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে। এটি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়।

আর্ট বা শিল্পকলা কী?

শিল্পকলা হলো- আমাদের এই যাপিত জীবনকে নানান উপায়ে তুলে ধরার যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্ময়কে মৃন্ময় আকারে তুলে ধরার যে প্রক্রিয়া সেটাই হলো শিল্পকলা।

শিল্পকলা হলো মানুষের সৃজনশীল কাজ বা চিন্তার এমন এক প্রকাশ, যা আদর্শ, চেতনা, সৌন্দর্য, আবেগ বা কোনো বিশেষ বার্তা তুলে ধরে। এটি মানুষের ভেতরের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি মাধ্যম। সহজভাবে বললে, যখন মানুষ তার ভাবনা, অনুভূতি বা সৌন্দর্যবোধকে কোনো রূপ, রং, শব্দ বা ভঙ্গিমার সাহায্যে প্রকাশ করে, তখন তাকে শিল্পকলা বলা হয়। শিল্পকলা সংস্কৃতির একটি অংশ। সংস্কৃতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার বা প্রতীকীভাবে তুলে ধরার একটি মাধ্যম হলো শিল্পকলা। নানা ধরনের শিল্পকলা রয়েছে। যেমন: চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য ইত্যাদি।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। আমাদের উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষ অতীতে সনাতন ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তারা বিশ্বাস করেন দেবী দুর্গার দশটি হাত। দশটি হাত তাঁর দশটি ভিন্ন শক্তি ও ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এই হাতগুলো শুধু শারীরিক অঙ্গ নয়, বরং তাঁর বিভিন্ন গুণের প্রতীক। প্রতিটি হাতে তিনি যে অস্ত্র ধারণ করেন, তারও রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। এই বিশ্বাস সনাতন ধর্মের অনুসারীদের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে চিন্ময় আকারে বা চেতনা (metaphysical or

conscious form) আকারে ছিল। এটা তাদের সংস্কৃতির একটা অংশ। **কিন্তু কোনো একদিন একজন ব্যক্তি এই বিশ্বাসকে মৃন্ময় আকারে তুলে ধরার জন্য বা দৃশ্যমান করে তোলার জন্য মৃত্তিকা বা পাথর দিয়ে দেবী দুর্গার একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন।** এই যে একটি বিশ্বাসকে দৃশ্যমান করে তোলা, একটি চিন্ময়কে মৃন্ময় করে তোলা, একটি চেতনাকে রং, রূপ, ভাষা, সৌন্দর্য দিয়ে সকলের সামনে কৃত্রিমভাবে তুলে ধরার এই মাধ্যমই হলো শিল্পকলা। নিজের বিশ্বাস, চেতনা ও ভাবনাকে মানুষ অন্যের কাছে তুলে ধরতে চায়। কেউ এটাকে চিত্রের মাধ্যমে, কেউ গানের মাধ্যমে, কেউ সাহিত্যের মাধ্যমে, কেউ ভাস্কর্যরূপে তুলে ধরতে পারে- এ সবই একেক ধরনের শিল্পকলার উদাহরণ।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন একজন মানুষ রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার কালো টেপ লাগানো। বুকে একটি কাগজে লেখা আছে- **আমার বাকস্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও।** এটা দেখেই আপনি বুঝে ফেললেন- ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এ এক নীরব প্রতিবাদ। এই যে প্রতিবাদের এক ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন প্রকাশ- এটাই হলো কলা, এটাই শিল্প।

এখানে একটি বিষয় হচ্ছে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহর কোনো প্রতিকৃতি (Image), অনুকৃতি (Replica), মূর্তি (Statue) বা প্রতিমা (Idol) হয় না এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত, পূজা বা আরাধনা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ কারো সদৃশ নন, তাঁর কোনো তুলনা নেই; তিনি এক ও অদ্বিতীয় (আহাদ) (সুরা ইখলাস ১)। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মুসলিম সমাজে আল্লাহকে বিমূর্তভাবে (Abstractly) অনুভব করার সংস্কৃতি এবং আচার-আচরণ গড়ে উঠেছে। মুসলমানরা সর্বদা অদৃশ্য সত্তা আল্লাহর প্রতি সেজদার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটায়।

শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির ব্যাপারে ইসলাম কতখানি উদার?

মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির প্রথম মানব আদম (আ.) থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রতিকূলতা, জীবিকার তাগিদ, সংঘাত-সংঘর্ষ ইত্যাদি কারণে আদম সন্তানেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে তাদের ভাষা, গায়ের বর্ণ, আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। সারা দুনিয়াতে হাজার হাজার ধরনের সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্য। শেষ আসমানি কেতাব আল কোর'আন সমগ্র মানবজাতির জন্য শেষ জীবনবিধান। এজন্য খেয়াল করলে দেখবেন, **আল্লাহ তা'আলা ঢালাওভাবে কোনো আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে কোর'আনে নিষিদ্ধ করেননি। তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীল কর্মকাণ্ড, অসঙ্গত বিরোধিতা, অনর্থক বাক্যালাপ, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং মানুষের মধ্যে অনৈক্য, ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেয় এমন কর্মকাণ্ড।** অধিকাংশ নিষেধাজ্ঞা হলো যারা ঈমান আনবে তাদের প্রতি আধ্যাত্মিক নির্দেশনা, যা অমান্য

করলে রাষ্ট্র কোনো শাস্তি দেবে না, কেবল এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে সতর্ক করবে। এই নিষেধাজ্ঞাগুলো অমুসলিমদের জন্য নয়। যেমন শুকরের মাংস, রক্ত, মৃত প্রাণী বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবেহ করা পশু খাওয়া মো'মেনদের জন্য হারাম। কিন্তু যদি কেউ অনন্যোপায় হয় তাহলে এই বস্তুগুলো সীমালঙ্ঘন না করে সে খেতে পারবে। আর ইসলামে যারা ঈমান রাখে না অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষ বা নাস্তিক তারা ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করেও শুকর খেতে পারবে, শুকরের খামার দিতে পারবে, তাদের কোনো বাধা দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই।

ইসলামে পোশাকের ধরন বা আঙ্গিকের (Style or form) ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ধুতি পরা যাবে না, কোট-টাই পরা যাবে না- এ ধরনের কোনো নিয়ম ইসলামে নেই। জুব্বা-পাগড়ি পরলেই মুসলিম, আর না পরলে মুসলমান পরিচয় শেষ, এমন কোনো বিষয়ও নেই। পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে আল্লাহ কেবল একটি মানদণ্ড দিয়েছেন, সেটি হলো- অশ্লীল পোশাক নিষিদ্ধ। **নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই নির্দেশনা একই: লজ্জাস্থান হেফাজত করতে হবে এবং প্রজনন অঙ্গ আবৃত রাখতে হবে। মো'মেন নারীদের জন্য অতিরিক্ত নির্দেশ হলো তারা তাদের বক্ষদেশকেও আবৃত করবে, তাদের বুক খোলা রাখা যাবে না।** এই হুকুম মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য, কারণ লজ্জাস্থান আবৃত না করা হলে মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়। পাশবিকতা থেকে মানবিকতার স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্যই আল্লাহ এই নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই এটি কোনোভাবেই আমাদের সংস্কৃতি চর্চার অন্তরায় নয়।

এই সীমা ইসলামের পণ্ডিতগণ, ফকিহগণ পুরুষদের জন্য নির্ধারণ করেছেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। এটুকু করলেই ফরজ পালন হয়ে গেল। বাকিটা হচ্ছে আপনার রুচি-অভিরুচি অনুসারে আপনি জিনাত বা সাজসজ্জা করতে পারেন। এটা করতে কাউকে নিষেধ করা হয়নি। প্যান্ট, শার্ট, টাই, কোর্ট, ধুতি, পাঞ্জাবি, শেরওয়ানি, জুব্বা, পাগড়ি এ সবই আপনি পরতে পারেন। তাহলে পোশাকের যে সংস্কৃতি সেটা ইসলাম অনুমোদন দিচ্ছে, ইসলাম এ ব্যাপারে কোনো বাধা দেয় না। নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে কোর'আন বলছে- লজ্জাস্থানের হেফাজত কর এবং বুকের উপর একটি কাপড় টানিয়ে দাও- ওয়াল ইয়াদ্‌রিবনা (টানিয়ে দেয়) বি খুমুরিহিন্না (আবরণ বা কাপড়) আলা জুয়ুবিহিন্না (বুকের উপর) (সুরা নুর ৩১)। এই নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে নারীদের মধ্যে যারা ইসলামে বিশ্বাস রাখে, যারা মো'মেনা তাদের জন্য। এটা একদিকে যেমন একটি জাগতিক শৃঙ্খলার ব্যাপার, অন্যদিকে একটি আধ্যাত্মিক নির্দেশনা। যদি কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে তাকে আল্লাহর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং নসিহত করা যেতে পারে। তবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন পরিস্থিতি বিবেচনা করে আইনগত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, ঠিক তেমনি পোশাক-আশাক সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও জাতির ইমাম বা আমির শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে এ ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারেন।

গান ও বাদ্যযন্ত্র কি হারাম?

সকল সভ্যতায় শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলো গান। গানের ব্যাপারে কোর'আনে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, এমনকি একটি নেতিবাচক শব্দও কোর'আনে পাওয়া যায় না। পবিত্র কোর'আনে সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি আয়াত রয়েছে, যেখানে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিষ্টাচারের বিষয়েও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, দান করার সময় খোটা না দেওয়া (সুরা বাকারা ২:২৬৪), অন্যের বাড়িতে খাওয়ার পর সময় নষ্ট না করা ও গৃহস্বামীকে অসুবিধায় না ফেলা (সুরা আহযাব ৩৩:৫৩), হাড়ি-পাতিলের মতো সামান্য জিনিস দিয়ে অন্যকে সাহায্য করা (সুরা মাউন ১০৭:৭) ইত্যাদি। যদি সত্যিই সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র হারাম হত, তাহলে আল্লাহ কোর'আনের কোনো আয়াতে তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি কোথাও এ জাতীয় কোনো কথাই বলেন নি। তথাপি, কিছু লোক সুরা লোকমানের ৬ নম্বর আয়াতের অপব্যাখ্যা করে একে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। **শিল্প ও সংস্কৃতিবিরোধী গোষ্ঠীর একমাত্র ভিত্তি কোর'আনের এই আয়াতের তাফসির; এ ছাড়া যা আছে তা হলো কিছু জাল-জয়িফ হাদিসের অপব্যাখ্যা ও বানোয়াট ফতোয়া।** সুরা লোকমানের ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অজ্ঞানতাবশত 'লাহওয়াল হাদীস' (অনর্থক, অবান্তর, অসার, অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজব বা বাক্য) সংগ্রহ করে এবং আল্লাহর পথকে হাসি-তামাশারূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" এখানে আল্লাহ সঙ্গীত শব্দটিই বলেননি, বলেছেন অসার কথাবার্তা। অথচ 'লাহওয়াল হাদীস' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলছে- এটা দ্বারা গান-বাদ্য ও কবিতাকেই নির্দেশ করে। এই অতিব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা করে গান-বাদ্যকে হারাম করা হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী গবেষক ও বহু গ্রন্থের লেখক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহা পরিচালক এ জেড এম শামসুল আলম তার 'মুসলিম সঙ্গীত চর্চার সোনালি ইতিহাস' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি লিখেছেন, "এ আয়াতে উল্লেখিত লাহ্ওয়া শব্দের অর্থ ব্যাপক। এর অর্থ খেলা, তামাশা, অসার কথা, অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ, অনর্থক কাজ ইত্যাদি যা মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে সরিয়ে রাখে অথবা বিরত রাখে। সঙ্গীতের জন্য আরবি ভাষায় পৃথক শব্দ আছে। **ওপরের আয়াতে যদি সঙ্গীতের নিষেধাজ্ঞাই উদ্দেশ্য হত, তবে গানের অর্থবোধক আরবি শব্দ যেমন 'গিনা' বা 'সামা', 'নাগমা' প্রভৃতিই ব্যবহৃত হত।**'

সঙ্গীতে সমাজ সচেতনতা, মানবিক ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষামূলক বার্তাও তো ধ্বনিত হতে পারে। সঙ্গীত বা সুর যদি মন্দ কিছুই হবে তাহলে আজান কেন সুর করে দেওয়া হয়? কোর'আন কেন সুর করে পড়া হয়? ওয়াজ কেন সুর করে করা হয়? তাছাড়া আসমানি কেতাববাহী প্রধান চারজন রসুলের অন্যতম দাউদ (আ.) এর মো'জেজাই ছিল তাঁর সুরেলা কণ্ঠ। তিনি হার্প (Harp) নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, যার ছবি ঐ সময়ের মুদ্রাতেও অঙ্কিত ছিল। তিনি বলতেন, On the harp I will praise you o God (Old Testament – Psalm 43.4)

মহানবীর যুগে কতকগুলো সঙ্গীতযন্ত্র ব্যবহৃত হত। তাঁর সম্মুখে যখন ওগুলো বাজানো হয় তখন তিনি তা নিষেধ করেন নি বরং শুনেছেন। বিশিষ্ট সাহাবী আবু মুসা আল আশ'আরী (রা.) সমকালীন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। আবু উসমান নাহদি বলেছেন যে, আবু মুসা (রা.) এর কণ্ঠস্বরের চাইতে মধুর কোনো সেতারা-দোতারা কিংবা বাঁশির সুর আমি শুনি নি। রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'একে তো দাউদ পরিবারের বাদ্যগুলোর একটি বাদ্য দেওয়া হয়েছে।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮ম খণ্ড - ইবনে কাসীর)

রসুলাল্লাহর উপস্থিতিতেও মদীনায় সাহাবীদের বিয়ে শাদি বা অন্য যে কোনো উৎসবে দফ বাজিয়ে গান গাওয়া হত। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও। এটা মসজিদে সম্পন্ন করো এবং বিবাহ উপলক্ষে দফ বাজাও।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।) একটি হাদিসে এমন কি এও বলা হয়েছে যে, 'হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী হলো- বিয়ের সময় দফ বাজানো এবং তা জনসম্মুখে প্রচার করা।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।) **সুতরাং মসজিদে বিয়ে সম্পন্ন করা এবং বিয়েতে গান-বাজনা করা রসুলাল্লাহর হুকুম।**

রসুলাল্লাহ (সা.) যখন হিজরত করে মদিনায় এসে পোঁছান তখন তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আনসার নারী পুরুষ শিশু কিশোর নির্বিশেষে দফ বাজিয়ে 'তালা-আল বাদরু আলাইনা - 'মিনসানইয়াতুল বিদা' হতে আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে' গানটি গাইতে থাকেন। গানটি আজও মিলাদে গাওয়া হয়।

মদিনায় এসে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় আল্লাহর রসুল (সা.) স্বয়ং গান গেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও গান গেয়েছিলেন। এই গানের নাম হচ্ছে রাজস্। আনাস (রা.) বলেন, রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ মসজিদ নির্মাণের সময় খেজুর গাছগুলোকে কেবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করলেন। চৌকাঠের দুই বাহুতে পাথর স্থাপন করলেন। রসুলাল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা তখন 'রাজস' তথা কর্মসঙ্গীত গাচ্ছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল। আপনি সাহায্য করুন আনসার ও মোহাজিরদের। - (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী।) সুতরাং সৎকাজের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য গান গাওয়াকে রসুলাল্লাহর সুন্নাহ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

আমাদের ধর্মীয় অঙ্গনে যুক্তিবুদ্ধির চর্চা এতটাই উঠে গেছে যে, এক শ্রেণির মুফতি এও বলে থাকেন যে, সব বাদ্যযন্ত্র হারাম, কেবল দফ হালাল, কারণ সাহাবিরা দফ বাজাতেন। প্রকৃত বিষয় হলো, সে যুগে আজকের মতো এত সব বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ছিল কেবল দফ, তাম্বুরা ইত্যাদি। সেগুলোই তারা বাজাতেন।

সুতরাং আল্লাহ যেমন সঙ্গীত হারাম করেন নি, তেমনি রসুলাল্লাহও (সা.) সঙ্গীত চর্চাকে নিষিদ্ধ করেন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের ব্যস্ততম পুরুষ, যিনি মাত্র ৯ বছরে ১০৭ টি ছোট বড় যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করেছেন, যিনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য এক মহান বিপ্লব সম্পাদন করেছেন।

এমন এক মহা বিপ্লবীর গান নিয়ে পড়ে থাকার অবসর ছিল না। তবু অবসরে নিজ গৃহে অথবা যুদ্ধ থেকে ফিরে সাহাবিদের সঙ্গে তাঁকে গান শুনতে দেখা গেছে।

একইভাবে সিনেমা, নাটক, অভিনয় হারাম নয়। আল্লাহ হারাম করেছেন অশ্লীলতা। আল্লাহ বলেন, "আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, হারাম করেছেন আল্লাহর নাফরমানি, অন্যায়-অত্যাচার চালানো, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না (সুরা আরাফ ৩৩)"।

এখানে তিনটি বিষয়কে হারাম করা হচ্ছে। এক- অশ্লীলতা। দুই- আল্লাহর নাফরমানি অর্থ আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধানের লংঘন করা, তিন- আল্লাহর সঙ্গে শেরক করা। এই মানদণ্ড মাথায় রেখে যে কোনো কাজ, সেটা শিল্পচর্চা হোক কি দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো কাজ তা ইসলাম পরিপন্থী বা নাজায়েজ কাজ হতে পারে না।

সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত, সাহিত্য বা যেকোনো মাধ্যমেই যখন অশ্লীলতা বিস্তার পায় তখন তা মানুষের আদিম পাশবিক প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। এর ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, সহিংসতা ও সংঘর্ষ অবধারিতভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে আমরা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত অশ্লীলতা প্রসারের করুণ ও বিধ্বংসী ফল দেখতে পাচ্ছি। পরকীয়া, বিবাহবিচ্ছেদ, সংসারে অশান্তি, ধর্ষণ, ব্যভিচার এবং অনৈতিক সম্পর্কের প্রসার সমাজে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল সভ্যতাবিনাশী অবক্ষয় থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার নিমিত্তেই কোর'আন অশ্লীলতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা অশ্লীলতার নিকটেও যেও না, তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে।' (সুরা আনআম ১৫১)।

ইসলামের দর্শন ও সংস্কৃতিচর্চার যোগসূত্র

ইসলামের দার্শনিক ভিত্তি হলো- মানুষ সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহর সাথে ইবলিসের একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছে। ইবলিস হলো এমন একটা সত্তা যে মানুষকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে আর আল্লাহ ন্যায় ও সত্যের দিকে ধাবিত করেন। ইবলিস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে, সে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে তাদের মধ্যে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, অন্যায়, অবিচার, যুলুম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা, রক্তপাত ইত্যাদি ঘটাবে আর আল্লাহ এগুলো থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে নবী-রসুল, পথপ্রদর্শক (হাদি) পাঠাবেন। যারা আল্লাহর পাঠানো হেদায়াহ বা সঠিক পথনির্দেশনা মেনে চলবে তাদের মধ্যে আর এই অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, রক্তপাত হবে না এবং তারা আখেরাতে জান্নাতে যাবে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য অশ্লীলতা হলো ইবলিসের একটি হাতিয়ার।

এজন্য গান, নাটক, সিনেমা ইত্যাদির মধ্যে যদি অশ্লীল কিছু না থাকে, অন্যায্য কিছু না থাকে, অনর্থক কিছু না থাকে বরং অর্থবহ কথা, মানবতার কথা, ঐক্যের কথা থাকে, আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণার কথা থাকে, মা-মাটি-মানুষের কথা থাকে, সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে সমগ্র মানবজাতিকে একজাতিতে পরিণত করার কথা

থাকে সেগুলো হারাম হবার কোনোই কারণ নেই, বরং সেগুলো প্রশংসনীয় কাজ হবে। আরবের মানুষ গান গাইত, রসুলাল্লাহ (সা.) নিজেও গান শুনেছেন এবং গেয়েছেন যেটা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। গান-বাদ্যের বিরুদ্ধে একটা হাদিস উল্লেখ করা হয় যে, তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি বাঁশি বাজানোর শব্দ শুনে তিনি দু'কানে আঙুল দিয়ে সেদিক দিয়ে চলে যান। পরে তিনি বলেন, 'নাফে, তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি?' নাফে বলেন, 'না।' তখন তিনি আঙুল কান থেকে সরিয়ে নেন। (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে ইবনু মাজাহ-৩৬৫০ ও আবু দাউদ- ৪৯৩০)। ইতিহাস বলে, তখন রসুলাল্লাহ (সা.) মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নৈতিক ও সামাজিক শাসক। তিনি কিন্তু বাঁশিওয়ালাকে খুঁজে বের করেননি, তাকে ধরে এনে শাস্তিও দেন নি, বাঁশি ভেঙ্গেও ফেলেন নি। হয়ত কোনো কারণে বাঁশির আওয়াজটা তাঁর কাছে অস্বস্তিকর লেগেছে। তাছাড়াও হাদিসের মধ্যে জাল, জয়িফ কত ধরনের হাদিস রয়েছে। **যাই হোক এই হাদিসকে যদি সঠিক হাদিস হিসেবেও ধরে নেই তাহলেও বলা যায়- এই ঘটনার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় না যে, গান-বাদ্য হারাম।** আমাদের কাছেও কিন্তু সব ধরনের সঙ্গীত, সব ধরনের সুর পছন্দ হয় না। অতিমাত্রার শব্দের সঙ্গীত বয়স্কদের পছন্দ নাও হতে পারে, আবার তার ছেলেমেয়েরা হয়ত সেই সঙ্গীত পছন্দ করছে। কাজেই সেই নির্দিষ্ট বাঁশির সুর রসুলাল্লাহর অস্বস্তির কারণ হতেই পারে, এতে গান-বাদ্য হারাম হয়ে যায় না। হারাম হলে তিনি ফরমান জারি করতেন, বাঁশি ভেঙ্গে ফেলতেন, বাদকদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই তিনি করেন নি।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবিত তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে সিনেমা হল থাকবে কিনা। আমরা তার উত্তরে বলতে চাই- বর্তমানে তো সিনেমা হল নেই বললেই চলে। জেলা শহরগুলোতে যে হলগুলো আছে সেগুলোও অত্যন্ত নিম্নমানের। আমরা এমন উন্নতমানের সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করব, যাতে মানুষকে বিদেশে গিয়ে মাল্টিপ্লেক্স থিয়েটারে মুভি বা কনসার্ট দেখে ডলার ব্যয় করতে না হয়। বর্তমানে হলিউড এত উন্নতমানের সিনেমা তৈরি করে যে আমরা সেগুলো দেখে বোয়াল মাছের মতো হা করে থাকি। **তারা সিনেমা তৈরি করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে। সেখানে তারা তাদের জাতির গৌরব, মর্যাদা ও শক্তি সামর্থ্যকে তুলে ধরে; অবশ্য বহু ক্ষেত্রে অশ্লীলতার বিস্তারও ঘটায়। কিন্তু আমাদের সিনেমা এখনও প্রেম ও বিনোদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।** সেগুলো এতটাই মানহীন আর হলের পরিবেশ এতটাই খারাপ যে রুচিশীল শিক্ষিত মানুষ আর হলে যায় না। আমাদের সংস্কৃতি তো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। আমরা সেই হারানো সংস্কৃতির একটা পুনর্জাগরণ ঘটাতে চাই। সংস্কৃতির নামে যেখানে কেবল স্বার্থ উদ্ধারের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলে তাকে কখনওই সুস্থ সংস্কৃতি বলা যায় না।

মধ্যযুগে (৬০০ খ্রি.-১৭০০ খ্রি.) মুসলিম শাসনামলে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং ভারতবর্ষে সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছিল। **ইসলামী দর্শনের জনক আল-ফারাবি'র বিখ্যাত সঙ্গীতগ্রন্থ 'কিতাব আল-মুসিকি আল-কবির' (সংগীতের মহান গ্রন্থ) এখনও সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এবং**

সঙ্গীততত্ত্ব গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। উমাইয়্যা, আব্বাসীয়, সেলজুক, অটোমান এবং মুঘল শাসকরা শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সে সময় মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, দরবার এবং প্রাসাদগুলো শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্রই নয়, শিক্ষার ও শিল্পকলার বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হত।

সংগীত এবং সাহিত্য এই সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। মুঘল শাসনামলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীত চর্চা হত। তখন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিলনে নতুন রাগ-রাগিনী এবং সংগীতধারার সৃষ্টি হয়েছিল। সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম মিয়া তানসেনের সৃষ্টি মিয়া কি মালহার, দরবারি কানাড়া, মিয়া কি টোড়ি এ সময়ের নতুন রাগ হিসেবে গণ্য। হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.) ও হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহ.)-এর মতো মহান সুফি সাধকরা তাঁদের খানকাহে 'সামা' বা 'কাওয়ালি' সংগীতকে ব্যবহার করতেন আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহর প্রেম, মানবতা ও আত্মশুদ্ধির পথ প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে। **অনেকে বলেন গজল জায়েজ, গান জায়েজ নয়। কী আর বলব! অজ্ঞতার কোনো সীমা নেই। গজল বলতে তারা বোঝান বাদ্যযন্ত্র ছাড়া ধর্মীয় সঙ্গীত হামদ নাত ইত্যাদি।** অথচ আরবিতে গজল শব্দের অর্থই হলো- 'প্রেমিকার সাথে কথোপকথন', 'প্রেমালাপ' কিংবা 'রমণীর সঙ্গে বাক্যালাপ'। অষ্টম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত আরবি সাহিত্যকর্মে গজলকে এভাবেই ব্যবহার করা হতো। কিন্তু নবম শতাব্দী থেকে সুফি সাহিত্যিকরা গজলকে নতুন অর্থে ও আঙ্গিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তারা এটিকে মাসুক (স্রষ্টা) ও আশেক (বান্দা) সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা এবং স্রষ্টার ঐকান্তিক প্রেম প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে রচনা করতে থাকেন। এ ধারার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি, হাফিজ শিরাজী, এবং আল-ইমরানি। তাদের গজলগুলোতে মানবীয় প্রেমের মতো অনুভূতি ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে মিশে আধ্যাত্মিক রূপ লাভ করে।

মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই সময়ে উদ্ভাবিত এবং উন্নতকৃত প্রধান বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে উদ (Oud), কানুন (Qanun), রাবাব (Rabab), নাফির (Nafir) এবং তাম্বুরা/তানপুরা (Tambourine)। এই বাদ্যযন্ত্রগুলো মুসলিম সমাজে বিনোদন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চর্চার অংশ ছিল। পরবর্তীতে এই বাদ্যযন্ত্রগুলো ইউরোপে ছড়িয়ে গিয়ে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যেমন উদ থেকে ল্যুট ও গিটার, নাফির থেকে ট্রাম্পেট সৃষ্টি হয়েছে।

মোটকথা, মধ্যযুগে মুসলিম শাসকরা সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের এই অবদানের কারণে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষ সংগীত, সাহিত্য, স্থাপত্য এবং বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই সাংস্কৃতিক প্রভাব আজও আমাদের ঐতিহ্য ও শিক্ষার ধারায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

আমাদের দেশের কৃষকেরা যখন দলবেঁধে কৃষিকাজ করেন, তখন তারা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ভাটিয়ালি বা ভাওয়াইয়া গান ধরেন। এই গান তাদের কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তপ্ত রোদের মধ্যে যখন কৃষক দলবেঁধে ধান কাটেন, তখন উদ্দীপনা প্রয়োজন

হয়। এই গান তাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে, কাজে নতুন শক্তি যোগায়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। সুর ও সঙ্গীত মানুষের মনের খোরাক। সঙ্গীত মানুষের কষ্ট দূর করে, ক্লান্তি দূর করে, মনে প্রশান্তি আনে। আবারও বলি, **সঙ্গীতের নামে উম্মাদনা, অশ্লীলতা এবং উচ্চশব্দের সঙ্গীত, যা মানুষের বিরক্তি সৃষ্টি করে এবং মন ও আত্মার ক্ষতি করে, তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হওয়া ইসলামের দাবি।**

সহিহ হাদিসে এসেছে- কেয়ামতের দিন আল্লাহ জান্নাতিদের বলবেনঃ 'তোমরা তেলাওয়াত করো।' তখন তারা তেলাওয়াত করবে, আর আল্লাহ তাদের কণ্ঠকে দাউদ (আ.)-এর সুরের মতো সুন্দর করে দেবেন। (সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম) এ থেকেই বোঝা যায়, আল্লাহ নিজেই সুরকে প্রশংসনীয় করেছেন। দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ এমন সুমধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন যে, পাহাড়-পর্বত ও পাখিরা তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে আল্লাহর তসবিহ পাঠ করত। আযানের সুরে আমরা আজও মোহিত হয়ে যাই, যদি সুললিত কণ্ঠে মুয়াজ্জিন আযান দেন। **সুরকে আল্লাহ্ মানুষের কাছে এতটাই মোহনীয় করেছেন যে, আলেমরাও সাধারণ কথা ওয়াজের মাহফিলে সুর করে বলেন। শ্রোতারা এই সুরেলা ওয়াজ শুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ হয়ে কাটিয়ে দেন।** আল্লাহ এই সুরকে মানুষের জন্য মোহনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে সুর কেন হারাম হবে! কাকের বেসুরো, কর্কশ কা-কা ধ্বনি শুনতে কারো ভালো লাগে না। কিন্তু কোকিলের কুহুতান মানুষের মন কেড়ে নেয়। এজন্যই ইমাম গাজ্জালি (র.) বলেছেন, কোকিলের বা মানুষের কণ্ঠনিসৃত সুর বা তারযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট সুর হারাম নয় (ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দিন-এর 'কিতাব আদাবুস সামা ওয়াল ওয়াজদ' অধ্যায়)।

আমরা মনে করি, আল্লাহর তওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একটি সেন্সর বোর্ড থাকা জরুরি। এই সেন্সর বোর্ডের কাজ হবে শুধু গানের কথা, নাটক, সিনেমা বা শিল্পের যেকোনো মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টিকারী, ঘৃণা ছড়ানো, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প, অশ্লীলতার প্রচার, আল্লাহর নাফরমানি ইত্যাদি অকল্যাণকর ও অন্যায্য উপাদান আছে কি না তা পরীক্ষা করা। যদি এ ধরনের কোনো উপাদান না থাকে, তবে সেই গান, নাটক, সিনেমা বা শিল্পকে রাষ্ট্র উৎসাহিত ও সহযোগিতা করবে। আর যদি এ ধরনের কোনো উপাদান থাকে, তাহলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট শিল্পী বা প্রযোজককে সেই অংশ সংশোধনের জন্য দিকনির্দেশনা দেবে।

রসুলাল্লাহ (সা.) এই কাজটিই করেছেন, সেন্সর করেছেন। গানকে বন্ধ করেন নি। রসুলাল্লাহর নারী সাহাবি রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনু আফরা (রা.) বলেন, 'আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী (সা.) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময়ে মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল। তাদের একজন গাচ্ছিল, আমাদের মধ্যে এক নবী আছেন, যিনি ভবিষ্যৎ জানেন। তখন রসুলুল্লাহ্ বললেন, এ কথাটি বাদ দাও, আগে যা গাইছিলে তাই গাও (সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৫১৪৭)।' **লক্ষ করুন, এখানে রসুলাল্লাহ (সা.) মেয়েদেরকে গান গাইতে বারণ করলেন না, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে একটি মিথ্যা ধারণা তিনি সংশোধন করে দিলেন।**

কাজেই আমরা এই নীতিই অনুসরণ করতে চাই। আমরা কারও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বা শিল্পচর্চা বন্ধ করার পক্ষে নই। আমরা কেবল চাই, শিল্প-সংস্কৃতি অশ্লীলতা এবং শিরক-কুফরমুক্ত হোক। আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট- আপনি যত পারেন গবেষণা করুন, সংগীত চর্চা ও সাধনা করুন, সিনেমা তৈরি করুন, নাটক নির্মাণ করুন, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করুন, নৃত্যকলা, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য তৈরি করুন- সবই করতে পারবেন। তবে শর্ত একটাই, তা হতে হবে অশ্লীলতা, শিরক ও কুফরমুক্ত। এই সীমারেখা না রাখলে মানব সমাজ ও সভ্যতা বিপন্ন হয়ে যাবে।

আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করব এবং বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা করব, তবে অন্যদের সংস্কৃতিকে অসম্মান করব না। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীরও আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদেরও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। আমরা তাদের এই বৈচিত্র্যকে সম্মান ও মর্যাদা দেব। কোনোভাবেই তাদের সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না। তবে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে যদি কোনো সংস্কৃতির নির্দিষ্ট অংশ অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ছড়ায়, দ্বন্দ্ব-সংঘাত উস্কে দেয়, অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায়, জুয়া বা অসুস্থ প্রতিযোগিতা বাড়ায় -অর্থাৎ সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে সংশোধনের জন্য তাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে আমাদের অধিকাংশের বেড়ে ওঠা ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। জন্মের মুহূর্ত থেকেই আমরা এই সংস্কৃতির ছোঁয়া পেয়েছি। **প্রথা অনুযায়ী, আমাদেরকে প্রথম শোনানো হয়েছে আজানের মধুর ধ্বনি, কোনো হিন্দি গান বা অন্য কিছু শোনানো হয়নি।** আল্লাহর নামই সবার আগে আমাদের কানে দেওয়া হয়েছে। এটাই আমাদের সংস্কৃতি। সাত দিন পর আমাদের নাম রাখা হয়েছে। এগুলো কী ধরনের নাম? আল্লাহর সিফতি নাম, যেমন আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেক, আব্দুল জাব্বার, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি। এছাড়া নবী পরিবার ও সাহাবাদের নামে, কিংবা কোর'আনের সুন্দর ও অর্থবোধক শব্দ থেকে নাম রাখা হয়। এটি আমাদের মুসলিমদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

অন্যদিকে, পহেলা বৈশাখে আমাদের গ্রামগঞ্জে বৈশাখী মেলা বসত। সেখানে হিন্দু-মুসলিম সকলেই দোকান দিত, কেনাকাটা করত। পিঠা-পুলি, মণ্ডা-মিঠাই খাওয়া হত। বাড়িতে বাড়িতে নানা ধরনের রান্না হত এবং আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করত। দোকানগুলোতে হালখাতা হত। সেখানেও মিষ্টি খাওয়া হত, দোকানের আগের বাকি পরিশোধ করা হত এবং নতুনভাবে খাতায় নাম লেখা হত। পাড়া-মহল্লায় উৎসবমুখর একটি পরিবেশ বিরাজ করত। এগুলো আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির পরিচায়ক। সকল ধর্মের মানুষই এই ধরনের সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত হয়। বর্তমানে এই বিষয় নিয়ে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এবং অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পহেলা বৈশাখ জায়েজ কি না-জায়েজ সেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ পহেলা বৈশাখের মূল বার্তা আজকের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সেই আনন্দঘন পহেলা বৈশাখ আর নেই। কৃষকের ঘরে সেই আনন্দও হারিয়ে গেছে।

আবার আমাদের সংস্কৃতি ছিল শবে বরাত, শবে কদর। **সারাদিন মা-চাচীরা নারিকেলে হালুয়া, চাউলের গুড়ার রুটি বানাতেন, গোশত রান্না করতেন, হালুয়া করতেন। নিজেরা খেতাম, প্রতিবেশী, গরিব-দুখিদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম।** সারা রাত মসজিদে মসজিদে মানুষ নামাজ পড়ত, মিলাদ হত। আবার ঈদ আসলে সবাই মিলে নতুন জামা পরে ঈদগাহে যাওয়া, শেমাই খাওয়া, কোলাকুলি করা, আনন্দ করা এবং কোরবানির ঈদের পশু কোরবানি করা - এগুলো সবই আমাদের মুসলিম সংস্কৃতির অংশ। এখন একদল লোক বলছে কোরবানি বন্ধ করতে হবে, আরেক দল বলছে পহেলা বৈশাখ হারাম, ওটা হিন্দুয়ানি। এই মানসিকতা দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে- আমার সংস্কৃতিকে সম্মান দেওয়া, আমার সংস্কৃতির চর্চা করা, আমার সংস্কৃতিকে তুলে ধরার অধিকার যেমন আমার আছে, আপনার সংস্কৃতিকে বিশ্বাস করা, শ্রদ্ধা করা, তুলে ধরার অধিকার আপনার আছে।

ইসলাম কখনো শেখায়নি যে, কপালে টিপ দিয়েছেন বলে আপনাকে রাস্তায় হেনস্তা করা হবে; তেমনি আমি মাথায় টুপি দিয়েছি বলে আমাকে মোল্লা বা উগ্রবাদী হিসেবে হেনস্তা করা হবে। এগুলোই বাড়াবাড়ি ও অসহিষ্ণুতা। আসুন আমরা একটা শুদ্ধ, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা করি। ইসলাম সংস্কৃতি চর্চার পথকে রুদ্ধ করেনি। ইসলাম একটি উদারনৈতিক জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনে শান্তি চায় ইসলাম। ইসলাম চায় আমাদের ভেতরের মানবিক সত্তার প্রকাশ ঘটুক। আমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাই -এটাই ইসলাম চায়। তেমনি মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর সীমারেখার কথা ভুলে গেলে চলবে না। একদিকে একদল মানুষ না খেয়ে মারা যাবে, অন্যদিকে অন্যদল কোটি কোটি টাকা অপচয় করবে সংস্কৃতি চর্চার নামে বেহায়াপনার বিস্তার ঘটাবে। ইসলাম এটা মেনে নেয় না।

আপনি যদি ফ্রান্স বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে যান, তাহলে দেখবেন তারা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও পৌরাণিক চরিত্রগুলোর মূর্তি বানিয়ে রেখেছে বিভিন্ন জায়গাতে। মূর্তিগুলো একেবারে নগ্ন। একেকটি মূর্তির একেকটি অর্থ তারা প্রকাশ করেছে। তাদের সংস্কৃতিতে এটা হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু এ ধরনের ভাস্কর্য আমাদের সংস্কৃতির সাথে যায় না।

আমাদের গ্রামীণ সমাজের মানুষগুলো এমন পরিবেশে বড় হয় যে, ছোট বেলা থেকেই হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে সে সচেতন হয়ে যায়। ঘুমাতে গেলেও লুঙ্গিতে গিঁট দিয়ে ঘুমায় যেন কোনোভাবে কাপড় হাঁটুর উপরে উঠে না যায়। এটা আমাদের সংস্কৃতি। **এখন আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার নামে যদি রাস্তার মাঝখানে একটি উলঙ্গ ভাস্কর্য দাঁড় করানো হয়, তা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। আমাদের সংস্কৃতির ধারাকে বুঝতে হবে এবং তাকে সম্মান করতে হবে।** আমরা কিন্তু এটা দেখে অভ্যস্ত হইনি যে, আমাদের মা-খালারা নগ্নভাবে চলবেন, শরীর প্রদর্শন করবেন।

আমাদের মা-খালা, দাদি-নানিরা শাড়ি পরেছেন, কেউ বা সালোয়ার-কামিজ পরেছেন। এর মধ্যে শহরের পরিবেশ, গ্রামের পরিবেশ, কৃষি পরিবার, ধনী-দরিদ্রের মাঝে পোশাক ও পরিচ্ছদের কিছু বৈচিত্র্যও অবশ্যই ছিল। তবে সার্বিকভাবে আমাদের

নারীরা যেমন নগ্নভাবে চলতেন না, আবার আপাদমস্তক প্যাকেটবন্দীও থাকতেন না। একটা ভারসাম্যপূর্ণ শালীনতাবোধ তারা বজায় রাখতেন।

আজ সেই ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে। একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে পোশাকের স্বাধীনতার নামে ও শিল্প অঙ্গনে নগ্নতা (Indecent exposure) বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে ধর্মের নামে নারীদের গৃহবন্দী করার প্রবণতাও বাড়ছে। আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট: এই বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে হবে। ইসলামে চরমপন্থা ও উগ্রপন্থা নিষিদ্ধ। ইসলাম হলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ দীন (দীনুল ওয়াসাতা), তাই নারীর পোশাকরীতি ও আচরণের মধ্যেও সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে। ইউরোপ-আমেরিকার সমাজব্যবস্থাকে পরমত সহিষ্ণু ও উদারনৈতিক বলা হয়। তবে আমি বলব, ইসলাম তার থেকেও বেশি উদার ও পরমত সহিষ্ণু। অপরদিকে **জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, পশ্চিমা বিশ্ব যেমন বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগে কঠোর ও আপসহীন, তেমনি ইসলামও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে কঠোর ও আপসহীন।**

শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করলে কী ফল হয়?

আজ পৃথিবী জুড়ে চলছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জয়জয়কার। তরুণ সমাজ হলিউড বলিউডের মুভি দেখছে, তাদের তারকাদের অনুকরণ করছে, ইংরেজি ও হিন্দি গান শুনছে। এই পরিস্থিতিই প্রমাণ করে যে দু'শ কোটির মুসলিম জাতির কোনো ভালো চলচ্চিত্র নেই; ভালো অনুকরণীয় শিল্পী নেই। এর কারণ হলো আমরা জাতিগতভাবে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। সংস্কৃতিচর্চার অনিবার্য চাহিদা পুরণে ব্যর্থতার ফলে আমাদের তরুণ সমাজ অপ-সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে।

একসময় মুসলিম সাহিত্যিকরা বিশ্বমানের সাহিত্য রচনা করেছেন। যে সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি-নৈতিকতা ও ইসলামি সংস্কৃতি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি মানুষ সেই সাহিত্যকর্ম থেকে সাহিত্য-রস আস্বাদন করেছে। কিন্তু আজ সেই মানের কোনো সাহিত্য মুসলিমদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে না। **কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমেদ, পল্লিকবি জসীম উদ্দীন, গোলাম মোস্তফাসহ যে বাঙালি মুসলিম কবি-সাহিত্যিক ছিলেন, তারা অসাধারণ সকল সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজ সেই সাহিত্যিক কোথায়?** ভালো সাহিত্য নেই, ভালো নাটক নেই, ভালো সিনেমা নেই, ভালো শিল্পী নেই। কাজেই এখন সবকিছুতেই আমরা বিদেশি সংস্কৃতির দ্বারস্থ। সবদিক থেকেই আমরা গোলাম।

এর মূল কারণ হলো: শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ির কারণে আমাদের এই দশা। আল্লাহ যা হারাম করেননি, আমাদের একশ্রেণীর আলেম সেগুলোকে হারাম ফতোয়া দিয়ে জাতিকে নিরুৎসাহিত করেছে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পথকে রুদ্ধ করেছে। এর বিষফল আমরা এখন ভোগ করছি।

এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে আমরা তওহীদ ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রস্তাবনায় বিষয়টি তুলে ধরেছি। এখন সময় এসেছে, ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের ধারণা পাল্টাতে হবে, আমাদের সম্পর্কেও ধারণা পাল্টাতে হবে। ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী যা